পরশুরামের গল্পে ধোঁকাবাজি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরশুরামের গল্পে ঠকরা খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র। আর ঠক থাকলে আহাম্মক (ইংরিজিতে থাকে বলে dupe, ডিউপ) থাকবেই, নাহলে ঠকবে কে? ধোঁকাবাজির গল্পে অবশ্য কাউকে না কাউকে বেকুব বনতে হয়।

পরশুরামের গল্পে ঠকদের নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।[১] এবার ধোঁকাবাজির কথায় আসা যাক।

ঠক আর ধোঁকাবাজ এর তফাত কোথায়? ইংরিজিতে hoaxer বলতে দুজনকেই বোঝায়। একটি ইংরিজি অভিধানে hoax কথাটির মানে দেওয়া আছে : a humorous or malicious deception (Concise Oxford Dictionary)। এই দু'রকমের উদ্দেশ্যকে আলাদা করতে চাই। যেখানে ঠকানোর পেছনে কোনো বদ মতলব আছে (মূলত টাকা হাতানো), সেখানে ঠকবাজি শব্দটি খাটে। আর যেখানে কোনো অসাধু উদ্দেশ্য নেই স্রেফ মজা করার জন্যে বা কোনো ভালো উদ্দেশ্যে কাউকে ঠকানো হয়, তাকে বলব ধোঁকাবাজি।

ধোঁকার তাহলে দুটো রূপ থাকতে পারে : (এক), কাউকে বোকা বানানো, তাতে কারুরই কোনো লাভ হয় না, কিন্তু গল্পটা জেনে মজা পাওয়া যায় প্রচুর, আর (দুই), কাউকে বোকা বানিয়ে, বা নিজের ভুল পরিচয় দিয়ে, কোনো কাজ হাসিল করা। তাতে কোনো আর্থিক লাভ-ক্ষতির ব্যাপার নেই, কিন্তু একটা সদ্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

দেখবার বিষয় এই যে, পরশুরামের প্রথম গল্প ছিল একদল ঠককে নিয়ে (''শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড)। তারপর মাঝে মাঝেই ঠকদের দেখা পাওয়া যায়। ধোঁকাবাজরা দেখা দেন অনেক পরে। ''রাজভোগ'' (১৯৪৮) গল্পের চলচ্চিত্র পরিচালক হাঁদুবাবুকে দিয়ে ধোঁকাবাজির সূচনা : পাতিপুরের রাজাবাহাদুর সেজে তিনি অ্যাংলো মোগলাই হোটেলের ম্যানেজারকে ঠকান। তবে সে একেবারেই নিষ্কাম ঠকানো, অর্থাৎ আদর্শ ধোঁকাবাজি। এরপর একে একে এসেছে ''চিরঞ্জীব'' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), ''জটাধর বকশী'' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), ''বটেশ্বরের অবদান'' (১৯৫৬), ''কামরূপিনী'' (১৯৫৬) আর ''চিঠিবাজি'' (১৯৫৭)। সবকটি গল্পেই মূলে একটা ধোঁকা আছে। তবে ডিটেকটিভ কাহিনীর মতোই গল্পের শেষটা আগে ধরা যায় না। কে কাকে কেন ধোঁকা দিচ্ছেন - সেটি নিষ্কাম না অল্পবিস্তর সকাম -তা জানা যায় গল্পর এক্কেবারে শেষে। ঠকদের কিন্তু গোড়া থেকেই ঠক বলে চেনা যায়, কারণ সেইভাবেই তাদের হাজির করা হয়েছে।

নিষ্কাম ধোঁকার ভালো উদাহরণ ''চিরঞ্জীব''। লংকুস্বামীর দাবি: তিনি বিয়ে করেছেন একশ উনিশবার, তাঁর বয়েশ পাঁচ হাজার পাঁচশ পঞ্চান্ন, অথচ ইংল্যাণ্ড-এর রাজা অষ্টম হেনরির মতো তিনি স্ত্রীবধ করেন নি, একজন গত হলে আর একজনকে বিয়ে করেছেন। তাঁর জীবিত বংশধরদের সংখ্যা এখন কয়েক লাখ। ভারতের বুকে যত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তার সবই তিনি দেখেছেন, এমন কি রাম - রাবণের যুদ্ধে তাঁকে লড়তেও হয়েছিল। এক গুজরাটী ভদ্রলোক বুঝে নিলেন: ''আপনি হচ্ছেন বিভীখন মহারাজ, রামচন্দ্রের বরে চিরঞ্জীব হয়েছেন।'' এই ভদ্রলোকটি আবার এক ''ফিলিম কম্পনির মালিক।'' তাঁর নয়া ফিলিম, 'রাবণ-সন্হার' -এ রাবণ পার্ট নেওয়ার জন্যে ইনি লংকুস্বামী -কে '২হাজার টাকা করে মহীনা দিতে রাজি।'' লংকুস্বামী শুধু কটমট করে তাকালেন। তাতেই ''লগনচাঁদ থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর হাত থেকে কার্ডখানা খসে পড়ে গেল।'' আসানসোল স্টেশন এসে গেল। সস্ত্রীক সংকুস্বামী ''বাঘের মতন নিঃশব্দে পা ফেলে প্লাটফর্মে নেমে পড়লেন।''

নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ গল্পর মজাটা প্রথমবার পড়ে সকলে ধরতে পারেন না। গল্পর শুরুতে দেখা যায় কয়েকজন বাঙালিকে। ট্রেনে চড়ে তাঁরা পশ্চিমে যাচ্ছেন। তাঁদের একজন, হরিহরবাবু, সর্বভারতীয় ঐক্যর জন্যে ব্যস্ত। কামরা সত্যি সত্যি জগন্নাথক্ষেত্র হয়ে যায়: নানা প্রদেশের নানা জাদের লোক বেঞ্চিতে ঠেসাঠেসি করে বসেন। তাঁদের মধ্যে এক স্থবির ও তাঁর যুবক শালাও আছেন। বৃদ্ধটি চারবার বিয়ে করেছেন; কলাগাছ নিয়ে পাঁচ। এখনও বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। তাঁর শুধু আক্ষেপ: ''কিন্তু শেষ পক্ষের সম্বন্ধী এই শরৎশালার জন্যেই তা হচ্ছে না, কেবলই ভাংচি দেয়।'' লংকুস্বামী এঁদেরই সহযাত্রী। প্রথমে তিনি তাঁর উপবিংশত্যাধিক শত (১১৯)তম সংসারের কথা বলেন। আর সেই সঙ্গে বলে রাখেন : ''বহুবিবাহে আমার ঘোর আপত্তি। যদিও আমার বড়দা আর মেজদার অনেক পত্নী ছিলেন।'' এইখানেই আভাস দেওয়া থাকে: লংকুস্বামী নিজেকে সাক্ষাৎ বিভীষণ বলে পরিচয় দেবেন (তাঁর বড়দা ও মেজদা যথাক্রমে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ)। গল্পর একেবারে শেষে লগনচাঁদ বাজাজ লংকুস্বামীর আসল পরিচয় বুঝে ফেলেন। কিন্তু বাঙালি যাত্রীরা সেটি ধরতে পারেন নি। হরিহরবাবু তো রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে প্রশ্ন করলেন, ''আপনি কে প্রভু?''

এইখানেই পাঠক - বিশেষ করে যাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী - তাঁরা ধোঁকায় পড়েন। তারপর লগনচাঁদ বজাজ (লগ্নির সঙ্গে নামটির যোগ আছে)যখন তাঁকে বিভীখন অর্থাৎ বিভীষণ বলে শনাক্ত করে, মজাটা তখন ষোলো কলা পূর্ণ হয়। তারপর লংকুস্বামীর কটমট করে তাকানো আর বাঘের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে চলে যাওয়া - এতেই বাকিটা বলা হয়ে গেল: লংকুস্বামী এতক্ষণ সবাইকে ধোঁকা দিয়েছেন, নিজের আসল পরিচয় না-দিয়ে তিনি জব্বর একটা গল্প ফেঁদেছিলেন।

জটাধর বকশী দিল্লির বিখ্যাত ক্যালকাটা টি ক্যাবিন-এ বাঙালি আড্ডাধারীদের চ্যালেন্জ্ নিয়েছিলেন : তিনি সকলকে ভূত দেখাবেন। তাঁর গল্প শুরু হয় ১৯৪১ -এর বর্মায়। বুভুক্ষু জাপানিরা জটাধর আর তাঁর ওপরওয়ালা, ক্যাপ্টেন ব্যাবিট-কে ঘিরে ফেলেছে। খাবারের অভাবে তারা ঐ দুই বন্দীকেই খাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্যাবিট-এর হুকুমে জটাধরকে ঐ সায়েবের সঙ্গে চারটে স্ট্রিকনীন-এর বড়ি গিলে ফেলতে হলো। ঐ বড়ি মাংসর টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে ক্যাম্পের বাইরে ফেলে রাখা হতো হিংস্র জন্তুজানোয়ার মারার জন্যে। মারাত্মক বিষ।

জটাধরের গল্পর শ্রোতাদের মধ্যে বীরেশ্বর সিংগি 'একটু বেশি ভীতু'। তিনি বারেবারেই শিউরে উঠেছিলেন। জটাধর যখন বলল, ''দুটো জাপানী আমাদের হাত পা বেঁধে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দিলে। আর দুটো জাপানী তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ-'', তখন বীরেশ্বরবাবু মাথা চাপড়ে চিৎকার করে বললেন, ''ওরে বাপ রে বাপ''। কথায় বাধা পড়ায় জটাধর চাটুজ্যে মশায়ের মতো চটে গেল না। শান্তভাবেই সে তার বাক্যটি শেষ করল: ''হাঁ মশায়, তলোয়ায়ের চোট দিয়ে ঘ্যাঁচ করে আমাদের মুণ্ডু কেটে ফেললে।'' এবার আর বীরেশ্বরবাবুর নন, বৃদ্ধ রামতারণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ''তবে বেঁচে আছেন কি করে?''

গল্পটি শেষ হয় এইভাবে :

''বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করলে, চেটেপুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনিনের তেতো টেরই পেলে না। তা পর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানী কনভলশন হয়ে পটপট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, আশ্চর্য দূরদৃষ্টি। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি এখন চললুম। ও কালী বাবু, আমায় বিলটা রামতারণবাবুই শোধ করবেন। নমস্কার।

জটাধর বকশী গল্পমালায় গল্প আছে তিনটি তার দ্বিতীয় গল্প, ''জটাধরের বিপদ'' -এ জটাধর নিজের ধোঁকাবাজির সাফাই গায় : ''গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসেজ, চিত্তের ডলাইমলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়।'' শুধু এই সাফাই নয়, সে উল্টে প্রশ্ন করে : ''আমি কি এমন অন্যায় কাজটা করেছি মশাই? রামতারণবাবু প্রবীণ লোক, ওঁকে ভক্তি করি, ওঁর সামনে তো ছ্যাবলা প্রেমের কাহিনী বলতে পারি না, তাই নিজেই নায়ক সেজে একটি নির্দোষ পবিত্র ভূতের গল্পর (বিশেষণ দুটি অসাধারণ)। তবে জটাধর যেটা বলে নি সেটা এই যে, তার গল্পর বলার পেছনে একটা বাজির ব্যাপার ছিল : ভূত দেখাতে পারলে জটাধরের চা চুরুট পানের দাম রামতারণবাবু যা খেয়েছে, তার দাম জটাধরই দেবে। সবাই একমত হয়ে বলেছিলেন : ''খুব ভালো প্রস্তাব, ভেরি ফেয়ার অ্যাণ্ড জেন্টালম্যানলি।'' এখানে জটাধরের ধোঁকাবাজিটাই আসল ব্যাপার, ঠকবাজিটা

নয়।

''জটাধরের বিপদ'' ও ''চাঙ্গায়নী সুধা''-য় জটাধর কিন্তু পুরোপুরি ঠক, যদিও পাতি ঠক।[২] তার খাঁই বেশি নয়। ন টাকা ছ আনা (এখানকার হিসেবে ন টাকা ছত্রিশ সাঁইত্রিশ পয়সা) আর ''চাঙ্গায়নী সুধা'' -য় আরেকটু বেশি : কুল মিলাকে পঁচাত্তর টাকার মতো।

১৯৬৫-৫৭য় পরশুরাম পরপর তিনটি ধোঁকাবাজির গল্প লেখেন। জটাধরের ভাষায় বললে, তিনটি ''পবিত্র নির্দোষ'' ধোকাবাজি; সদ্ উদ্দেশ্য ছাড়া বা বিশুদ্ধ মজা করা ছাড়া আর কোনো মতলব এইসব ধোঁকাবাজির পেছনে নেই।

প্রথমে ''বটেশ্বরের অবদান''। 'অবদান' শব্দটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতো পরশুরামেরও বোধহয় একটু আল্যার্জি ছিল। ''রাতারাতি'' গল্পে চাটুজ্যে মশায় অ্যাংলো - মোগলাই রেস্তোরাঁর 'নবতম অবদান' - মুরগীর ফ্রেঞ্চ মালপো, কচি ভাইটো পাঁটার ইস্টু' - খেতে রাজি হন নি। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, ''না বাপু, অবদান খাবার আর বয়স নেই।''[৩]

সে যাই হোক, বটেশ্বরের অবদানটি কিন্তু সত্যিই মনে রাখার মতো। তিনি একজন বাণিজ্যসফল ঔপন্যাসিক। ''তাঁর কোনও উপন্যাস সাতশ পৃষ্ঠায় কম নয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বুভুক্ষু পাঠক - পাঠিকারা তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন এবং পরবর্তী রচনার জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করেন।'' 'প্রগামিনী'' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কে থাকে কে যায়' নামে তাঁর একটি উপন্যাস বেরচ্ছে। তার নায়িকা অলকা টি বি স্যানিটেরিয়ামে আছে। প্রিয়ব্রত বলে বছর তিরিশ বয়সের এক অচেনা যুবক একদিন বটেশ্বরের কাছে এসে হাত জোড় করে অনুরোধ করল : মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বটেশ্বর তাকে হাঁকিয়ে দিলেন। পরের দিন ফোনে আগে থাকতে ঠিক করে এক ডাক্তার এসে হাজির। তাঁরও আবদার একই : মেয়েটিকে পুরো সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। বটেশ্বর তাঁকে বোঝালেন : তা হওয়ার জো নেই, কারণ তংার রচনাটি ট্র্যাজেডি। ডাক্তার তা শুনতে রাজি নন। কোন্ চিকিৎসায় মেয়েটি বাঁচবে তাও তিনি বাতলে দেন। বটেশ্বর তাতেও নারাজ দেখে তাঁকে তিনি শাসিয়ে গেলেন : ''বেশ, যা খুশি করুন, আপনার পরম ভক্ত দু-লাখ পাঠক আর চার লাখ পাঠিকা চলে গিয়ে আপনাকে শাপ দেবে, আপনার এক কুকর্মের ফল পরলোকে ভুগতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, এখনকার ছোকরারা ভাল নয়। আচ্ছা চললুম। যদি হাড়টাড় ভাঙে তো খবর দেবেন। নমস্কার।''

তার তিনদিন বাদে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি সুন্দর মেয়ে হঠাৎ এসে হাজির। সে চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী, মধ্যগগনের তারকা না হলেও উদীয়মানা। তার নাম (আসল নাম নয়, টলিউড -এর ছদ্মনাম) কদম্বানিলা। তার প্রস্তাব : কে থাকে কে যায়' বইটি নিয়ে একটি সিনেমা হবে। সে হবে নায়িকা। কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা মরবে শুনে সে হতাশ। বটেশ্বর তাতে রাজি নন দেখে কদম্বানিলা বললে: 'তা হলে চললুম, গল্পসরস্বতী দামোদর নস্করের সঙ্গেই কথা বলি গিয়ে। তাঁর ''মানস-মরালী'' উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে, তার নায়িকা মঞ্জুলার পাটটিও আমার বেশ পছন্দ।'

এই শুনে বটেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন কারণ দামোদরকে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন। ভাববার জন্যে বটেশ্বর দু-দিন সময় চাইলেন, কিন্তু কদম্বনিলা তাতে রাজি নয়: তখুনি একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। অগত্যা বটেশ্বর রাজি হলেন।

উপন্যাস তো মিলনান্তক হলো। তার পর আটমাস হতে চলল, তবু কদম্বানিলার পাত্তা নেই। একদিন সকালে বটেশ্বরের বাড়িতে সেই সঞ্জীব ডাক্তার প্রিয়ব্রত আর একটি অচেনা মেয়ে এসে হাজির। ডাক্তার -ই বললেন : এই মেয়েটি প্রিয়ব্রতর স্ত্রী, তাঁর শালী। তার নাম অলকা। সেও স্যানিটেরিয়মে ছিল, 'কুক্ষনে তার হাতে এল ''প্রগামিনী'' পত্রিকা' তাঁর মাথায় এক বেয়াড়া ধারণা হলো, ''গল্পের অলকা যদি বাঁচে তবেই আমি বাঁচব, সে যদি মরে তবে আমিও মরব। বাধ্য হয়ে প্রিয়ব্রত ও সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরকে দিয়ে গল্পটি মিলনান্তক করানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তখন সঞ্জীবের স্ত্রী, অনিলা বললেন: ''তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না, যত সব অকম্মার ধাড়ী, আমি - ই যাচ্ছি, দেখি বুড়োকে বাগ মানাতে পারি কিনা।'' সঞ্জীব বললে : ''সে আপনার সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল করল। আপনিও গল্পের প্লট বদলালেন, অলকাও চটপট সেরে উঠল। এখন কি রকম মুটিয়েছে দেখুন।''

অভিনেত্রী সেজে সঞ্জীবের স্ত্রী অনিলা এইভাবেই বটেশ্বরকে একই সঙ্গে লোভ দেখিয়ে ও ঈর্ষা জাগিয়ে একটি ভালো কাজ করিয়ে নিলেন। ঐদিন অনিলা আসতে পারেননি, কারণ তাঁর একটি খোকা হয়েছে। সঞ্জীব বলেন, তাঁর স্ত্রী ''অতি ধড়িবাজ মহিলা'', একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে বটেশ্বরের কাছে এসে ''ধাপ্পাবাজির জন্যে মাপ' চাইবে। নিজের উপন্যাসের শেষটা বদলে বাস্তবে বটেশ্বর সত্যিই একটা অবদান রাখলেন।

''কামরূপিনী'' -ও এমন এক নির্দোষ ধোঁকাবাজির গল্প। শীতল চৌধুরীকে ছোটো বড় সকলেই শীতুমামা বলে ডাকে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একদল বসে আছে। পিকনিক বটে, কিন্তু খাবার আসবে বাইরে থেকে। সুকমলের বৌভাতের ভোজটা এখানেই খাওয়া হবে। ছ বছরের এক বাচ্চাকে শীতুমামা রূপকথার গল্প বলেছিলেন। তাতে রাক্কুসীর কথা ছিল। বাচ্চাটির মা শীতুমামাকে ঐ ধরণের ''বেয়াড়া মিথ্যে গল্প'' বলতে বারণ করলেন। শীতুমামাও সে-কথা শুনলেন। কিন্তু তার শোধ তুললেন দারুণ। এবার বড়দের জন্য তিনি একটা গল্প ফাঁদলেন। সে-গল্পর প্রধান চরিত্র বলভদ্র মদ্ররাজ। আসামের জঙ্গলে মায়াবতী কুরুঞ্জি বলে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু হঠাৎই বলভদ্র বেপাত্তা। শুধু দেখা গেল মায়াবতীর বাড়ির বারান্দায় বাদামি রঙের এক নধর ভেড়া ধামা থেকে ভিজে ছোলা খাচ্ছে।

সব শ্রোতাই ধরে নিলেন : বলভদ্রকেই মায়াবতী ভেড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

শীতুমামার গল্প শেষ হওয়ার পরেই অন্যদের সঙ্গে দুজন মহিলা অনেক রকম খাবার নিয়ে পৌছলেন। একজনের নাম মায়াবর্তী মর্দরাজ, তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অন্যজন তাঁরই মেয়ে মোহিনী, বয়স বাইশ - তেইশ। ''দুজনই অসাধারণ সুন্দরী, যদিও চোখ আর নাক একটু মঙ্গোলীর ছাঁদের।'' এই মোহিনীর সঙ্গে সুকমলের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সুকমল এল না কেন? ''মধুর কণ্ঠে মোহিনী গুপ্ত বললেন, 'সুকমল? তার কথা আর বলবেন না, পুওর ফেলো। কোথাও উধাও হয়েছে কিছুই জানি না।'' একটা টেলিগ্রাম পেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সুকমল চলে গেছেন। সেই শুনে তো সকলে আঁতকে উঠলেন; মায়াবতীদের আনা 'পবিত্র ভেড়ার মাংস' -র কাটলেট, 'ফ্রাই ইত্যাদি খেতে রাজি হলেন না। এমন কি তাঁদের আনা সোডাও কেউ মুখে তুলতে নারাজ।

বাড়ি ফিরে সব শুনে পরিবারের কর্তা বীরেন বললেন : ''ছি ছি কি কেলেঙ্কারী করলে তোমরা। এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। শীতুমামার গাঁজাখুরী গল্পটা বিশ্বাস করলে। উনি নিজে তো গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছেন।''

শিতুমামা নিশ্চয়ই জানতেন সুকমলের শাশুড়ির নাম কী। নইলে তাঁর গল্পর নায়িকার নাম মায়াবতী মর্দরাজ হবে কেন? শীতুমামা সকলকে ধোঁকা দিলেন দারুণ, যদিও সুকমলের না-আসার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই তাঁর জানা ছিল না। ঘটনাচক্রে সুকমল উধাও হলো, শীতুমামা গল্পকে যেন সত্যি বলে প্রমাণ করার জনেই।

ধোঁকাবাজির লাই পরশুরামের শেষ গল্প 'চিঠি বাজি''। ভালো ছেলে সুকান্ত দত্তর বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন তার মামা। সুকান্তর মনে হলো : বিয়ের আগে হবু কনেকে নিজের মাইনাস পয়েন্টগুলো একের পর একটি চিঠি দিয়ে জানাবে। হবু কনে, সুনন্দা ঘোষও তাকেই অনুসরণ করল। যেমন, সে আদৌ ফরসা নয়, তারও জীবনে একটি পুরুষ আগে এসেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুকান্ত তার কোনোটাতেই আপত্তি করে না; ভালোভাবেই সবকিছু নেয়। শেষ চিঠিতে সুনন্দা হঠাৎ -ই জানাল ? তার পুরনো প্রেমিক ফিরে এসেছে, বিয়ের দুদিন আগে তার সঙ্গে সে পালাবে। তবে সুকান্ত একেবারে আতান্তরে পড়বে না; সুনন্দার বোন, নন্দার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। নন্দা অতি চমৎকার মেয়ে, সুকান্তর কোনো অসুবিধে হবে না।

চিঠিটা পড়ে সুকান্ত প্রথমে হতভম্ব হলো, খুব রেগেও গেল। ''কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক'', তাই কাউকে কিছু না বলে সে বিয়ে করতে গেল। বিয়ের আগে তার হবু শালার কাছে শুধু জানতে চাইল, ''সুনন্দা চলে গেছে?'' সে তো অবাক: বিয়ের কনে কোথায় চলে যাবে? পরের কথাগুলো এই রকম :

- তোমার আর এক দিদি নন্দা, তার খবর কি?
- বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।
- সুকান্ত চোখ কপালে তুললে বলল, ও।

বাসরঘরে যখন আর কেউ নেই, ব্যাপারটা জানা গেল। তখন। সুনন্দারই আটপৌরে ডাকনাম নন্দা। কোনো কুমতলব তার ছিলো না। ''সত্যবাদী উদারচরিত্র ভাবী

বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।" তার কোনো পুরনো প্রেমিক ছিল না। এইভাবে আরও দু-চার কথার মধ্যে দিয়ে গল্প শেষ হয়।

''বটেশ্বরের অবদান'' -এর মতো এ গল্পেও ধোঁকাবাজি করে একটি মেয়ে। দুরকম নামের খেলা দুটি গল্পই আছে। বাকি গল্পে ধোঁকাবাজজরা সবাই পুরুষ। জীবনের শেষ পর্বে পরশুরাম কিছু মধুর রসের গল্প লিখেছিলেন। ''চিঠি রাজি" তারই একটি। ''বটেশ্বরের অবদান" -এ পেশাদার উপন্যাসজীবিদের নিয়ে যেটুকু ব্যঙ্গ ছিল, এখানে সেটুকুও নেই। ভালো লোক।

পরশুরামের গলপে নানা কিসিমের ঠক একটি বড় আকর্ষণ। শ্যামানন্দ - গণ্ডোরিরাম থেকে গনৎকার মিনান্দার দ মাইতি (আসল নাম : মীনেন্দ্র মাইতি) পর্যন্ত তার বিস্তার। তাদেরই পাশাপাশি ধোঁকাবাজির ঘটনা নিয়ে পরশুরামের কয়েকটি চমৎকার গল্প উপহার দিয়েছেন। এসব গল্পে চরিত্রের চেয়ে পরিস্থিতিই বড়। ফলে 'ঠক' বলতেই যেমন অনেক কটি চরিত্র মিছিল করে আসে, 'ধোঁকাবাজ' বলতে তেমন কোনো বিশেষ চরিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে না।

টীকা ঃ-

১. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'এক ঠক দুই ঠক তিন ঠকের মেলা', 'সাংস্কৃতিক সমসময়', অক্টোবর ২০০১. পৃ: ১২-১৯দ্র.।

২. পরশুরামের ঠকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : পেশাদার ঠক, পাতি ঠক (অর্থাৎ ছোটো মাপের ঠক), আর ধর্মীয় ঠক। টীকা ১দ্র.।

৩. 'তাসের দেশ', দৃশ্য ২দ্র.। আমি অবশ্য বুঝি না ''অবদান' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিটা ঠিক কী, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে কথাটা তো খারাপ অর্থে বসেনি; রবীন্দ্রনাথের নিজের অন্য লেখাতেও না। মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, 'সাময়িকী', দে'জ পাবলিক ১৩৯৮, পৃ. ১১৮ টীকা দ্র.।

৪. ''কদম্বনিলা'' নামটির মধ্যেই মজা আছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 'পরশুরামের হাসি'', ''এবং এই সময়'', গ্রীষ্ণ সংখ্যা ১৪১১, পৃ. ৭৭ টীকা ১১ দ্র.।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : অমিতাভ ভট্টাচার্য, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়।